মুরজিয়া সম্প্রদায় : ইতিহাস ও বিশ্বাস

মোহাম্মাদ আল কুরাইশি

হোসাইন আহমদ

আগেকার সময় মুসলিম জাতি সবসময় বেদাত প্রত্যাখ্যান করেছে এবং এর বিরুদ্ধে সবসময় যুদ্ধ করেছে; ফলশ্রুতিতে তারা সঠিক পথে ছিল এবং ইসলামের আলো ছিল উজ্জল। কিন্তু তারপর এই জাতি বেদাত এবং বেদাতীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অলস আর উদাসীন হয়ে পড়ে। এটা ঘটল যখন ধর্মীয় ব্যাপারে অসচেতনতা বাড়ল এমতাবস্থায় বেদাত ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল আর তার অনুসারী ও সমর্থক তৈরি বাড়তে লাগল।

প্রথম যখন বেদাতের উদ্ভব হয়, তা সঠিক ধর্ম পদ্ধতি ও সুন্নাহর বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। পরিস্থিতির অবনতি হতে থাকলে একপর্যায়ে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, যদি বেদাতের বিরুদ্ধে লড়াই করা হত, তাহলে অনেকেই দাবি করতে লাগলো যে প্রকৃত সুন্নাহ বিপদের মাঝে পড়ে গেছে। এই বিপথগামীদের মধ্যে অন্যতম একটি সম্প্রদায় হল 'আল-মুরজিয়া' (শাব্দিক অর্থ মুলতবিকারী)। মুরজিয়া শব্দটি ইরজা শব্দমূল থেকে এসেছে, যা কুরআনের এই আয়াতে উল্লেখ আছে: 'ওয়াতারজুনা মিনাল্লাহি মা-লা ইয়ারজুন'। যার অর্থ হচ্ছে, 'তোমরা আল্লাহর কাছে আশা কর, যা তারা আশা করে না।'

ইমাম ইবনে কাসীর এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: 'তোমরা এবং কাফিররা দু'দলই ভোগান্তির শিকার হবে, কিন্তু তোমরা আল্লাহর ক্ষমার আশা কর, আশা কর তার দেয়া বিজয় ও সহযোগিতার। অন্যদিকে কাফিররা এর মধ্যে কোনটিই আশা করে না। তাই, জিহাদের দ্বায়িত্ব আদায়ে তোমরা বেশি অধ্যবসায় ও দৃঢ়।'

অন্য আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন, 'মা লাকুম লা তারজুনা লিল্লাহি ওয়াকারা'। আয়াতের অর্থ হল, 'তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব আশা করছ না।' সূরা নূহ, আয়াত : ১৩

আল্লাহ আমাদেরকে জিজ্ঞেস করছেন, আমরা কেন তাকে খোদা হিসেবে চিন্তা করে এবং তার শাস্তির কথা ভেবে তাকে ভয় করি না।

অন্য একটি আয়াতেও আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'ক্বালু আরজিহ ওয়া আখাহু ওয়া আরসিল ফিল মাদায়িনি হাশিরিন।' আয়াতের অর্থ হল, 'তারা বলল, আপনি তাকে ও তার ভাইকে অবকাশ দান করুন এবং শহর-বন্দরে লোক পাঠিয়ে দিন লোকদের সমবেত করার জন্য। সূরা আরাফ, আয়াত :১১১

অতএব, ভাষাগতভাবে ও উপরে উল্লেখিত আয়াতগুলোর আলোকে, মুরজিয়া'র অর্থ (বিপথগামি সম্প্রদায়) হল, সকল আমল ও কাজকে একপাশে রেখে তা বিস্বাস থেকে আলাদা করে দেয়া। আর এভাবে তারা সকল পাপাচারীকে এই আশা দেয় যে তাদের পাপ তাদের ঈমানের সংগে সাংঘর্ষিক নয়।

একবার মুরজিয়াদের একসময়কার সবচেয় বিখ্যাত ব্যক্তি বলেছিল যে, তাদের বিশ্বাস সেরকম ভালো, যেরকম ভালো ছিল জিবরাঈল, রাসূল (সা.) এবং আবু বকর ও উমরের। আসলে মুরজিয়ারা বিশ্বাস করে আমল ও বিশ্বাস কোনোভাবে একটা আরেকটার সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। বিশ্বাসের উপর আমলের কোনই প্রভাব নেই, সেটা ইতিবাচকভাবে হোক কিংবা নেতিবাচক হোক।

মুরজিয়াদের উৎপত্তি

মুরজিয়া আন্দোলন শুরু হয় খারিজী ও শিয়াদের প্রাদুর্ভাবের সাথে। খারেজীরা ঘোষণা করেছিল সকল সাহাবী কাফের। এমতাবস্থায় কিছু শিয়া উসমান, মোয়াবিয়া, আয়শা এবং আরও অনেককে কাফির ঘোষণা করে। তারপর আলীকে তারা মানুষের কাতার থেকে অনেক উপরের মর্যাদা দিয়ে দিল। আর এই দুই অবস্থার মাঝখানে তৃতীয় আরেকটি দলের উদ্ভব হল, যারা দাবি করল, এ দু'দলের কোন একটির ব্যাপারে রায় দেওয়ার মাধ্যমে তারা অন্যটিকে মান্য করবে না। নিশ্চিতভাবে এই গ্রুপ সেসব ন্যায়বানদের মতের সাথে অসংগতি রাখে, যারা বিশ্বাস করেন ও সম্মান করেন রাসূল (সা.)- এর সকল সাহাবাকে।

সর্বপ্রথম যে ইরজা করে তার নাম হল বাসর বিন আবদুল্লাহ আল হামদানি। তার সময়কার সব মানুষ তার বিরোধিতা করেছেন। এমনকি তারা কখনও তার সালামের জবাব দেননি। এরপর ইরজা'র এই বেদাত ইরাকের কুফায় ব্যাপক আকার ধারণ করে। আর সেখানে মুহাম্মাদ ইবনে কাররাম এর মত লোকেরা তার নেতৃত্ব দিচ্ছিল।

মুরজিয়াদের ইতিহাস।

মুরজিয়াদের বিভিন্ন উপদলের আবির্ভাবের পর তাদের বিশ্বাসের মধ্যেও বিরাট তারতম্য সৃষ্টি হল। একটি উদাহরণ, যেমন: তাদের একটি উপদলের নাম আল জাবরিয়া যারা বিশ্বাস করে মানুষের কোন ইচ্ছাশক্তি নেই; অন্যদিকে তারা আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণাবলীর বিষয়ে (আল আসমা ওয়াস সিফাত) তারা সকল গুণাবলীকে নাকচ করে, এমনকি তাদের কেউ কেউ জান্নাত ও জাহান্নামের পরিসমাপ্তিতে বিশ্বাস করে। তাদের কিছু লোকের বিশ্বাস তো এমন নিম্নস্তরে

নেমেছে যে, মহান আল্লাহকে সম্মান দেখানোর নাম করে আল্লাহর ব্যাপারে রায় দিয়ে দেয়। তার নামকে অস্তিত্বহীন বলে এবং আল্লাহর গুনাবলীকে অস্বীকার করে। কিন্তু এইসব দল তাদের একটি বিশ্বাসে ঐক্যবদ্ধ যে, বিশ্বাস কখনও বাড়ে না, কমেও না। তারা সকলে একমত যে, বিশ্বাসের উপর আমল কোনোভাবেই প্রভাব ফেলে না। কোনো কিছুই বিশ্বাসের ক্ষতিসাধন করে না। সেটা বড় পাপ হোক কিংবা ছোট পাপ। আর এই বিশ্বাসের মাধ্যমে তারা জাতিকে শয়তানের রাস্তায় নিয়ে গেছে।

উম্মাহর মধ্যে ইরজা'র লক্ষণ

বর্তমানের পথভ্রষ্ট লোকেরা কিছু ব্যাপারে নির্দিষ্ট করে ও কোনো ব্যাপারে সাধারণভাবে মুরজিয়া'র বিশ্বাসের অনুসরণ করছে। বিশ্বাস ও ধর্মের নামে তারা কাফের ও ডিকটেটরদের কাজকে আশীর্বাদ দিচ্ছে। অন্যদিকে যখন সুন্নাহর সঠিক ও বিশ্বাসী অনুসারীদের বিষয় সামনে আসে, তখন তারা অত্যন্ত কঠোর অত্যন্ত নির্দয় হয়ে এসব সত্যনিষ্ঠদেরকে কাফের বলে। আর সমান সময়ে তারা জালেম সৈরাচারীদের ঈমানের সত্যায়ন করে। এসব পদক্ষেপ অভাগাদের পথভ্রষ্টতার ফল। আর তাই জাহম বিন সাফওয়ান আমদেরকে বলে যে, আল্লাহ ও তার রাসূল (সা.) সম্পর্কে জানাটাই যথেষ্ট একজন লোকের ঈমানদার প্রমাণিত হওয়া এবং মৃত্যুর পর তার জান্নাতের নিশ্চয়তা পাওয়ারর জন্য।

মুরজিয়াদের নেতিবাচক প্রভাব

ক) ঈমানের উপর:

তারা কোরআন, সুন্নাহ ও সাহাবীদের পথকে উপেক্ষা করার অনুমতি দিয়ে মানুষকে আল্লাহ তা'আলার লা'নতের মধ্যে ফেলেছে। যা ক্রমেই তাদেরকে আল্লাহর অনুকম্পা ও দয়া থেকে দূরে সরিয়ে নিবে।

খ) নৈতিকতা ও আচরণে:

মুরজিয়ারা এই বক্তব্য দিয়ে মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছে যে, তাদের জন্য বেহেশতে যাওয়ার জন্য সকল আমল করা গুরুত্বপূর্ণ নয়। মানুষের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ লোক সবচেয়ে ঈমানদার লোকের সাথে জান্নাতে একসাথে থাকবে। এই ধারণা নৈতিকতা ও মর্যাদাকে ভুলুণ্ঠিত করেছে। এটা আল্লাহর তা'আলার দ্বীন নিয়ে উপহাসও করেছে। আর এভাবে পর্যায়ক্রমে যখন মর্যাদা ভুলুণ্ঠিত হল, তা মানুষকে ধীরে ধীরে তাদের দ্বীন থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। তখন তারা বিশ্বাস করতে থাকে যে, তারা সাহাবীদের মধ্যে মর্যাদানবানদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

গ) ধর্মীয় দৃষ্টিতে:

আল্লাহ তা'আলা ও তার রাসূলের (সা.) দ্বারা যে লোক কাফির হওয়ার যোগ্যতার মধ্যে পড়ে, তারা তাকে ইসলামের অধিকার দিয়েছ। তারা তাকে মুসলিম মহিলাকে বিয়ে করার অনুমতিও দিয়েছে, যখন সঠিক ধর্মমতে এই বিবাহ অবৈধ।

আপনারা অনুভব করবেন যে, যখন মুরজিয়া প-িতরা দেখল তাদের বিশ্বাসের এই দুরাবস্থা! তখন তারা মানুষকে কাফির হিসেবে নাম দেয়া ও শ্রেণীভুক্ত করার রাস্তা বের করল । সুন্নি মানুষের মধ্যে এমন বৈশিষ্ট পরিচিত নয়। আর নিজেদেরকে ধর্মীয় ব্যাপারে দায়িত্বজ্ঞানশূন্য লোকদের ব্যাপারে অসহনশীল উপস্থাপন করত। তারা সুন্নাহর অনুসারীদের সাথে একমত হল সেইসব লোকদের কাফির আখ্যা দিতে, যারা কাফির হওয়ার উপযুক্ত। কিন্তু তারা এটা করল, চতুরতার সাথে।

যেমন- তারা সুন্নাহর অনুসারীদের সাথে একমত হল যে, কেউ যদি আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং কুরআনকে নিয়ে ঠাট্টাতামাসা করে, সে কাফির হবে। কিন্তু তারা ওই ব্যক্তিকে তার কাজের জন্য কাফির বলে না, যে কাজ তাকে ইসলামের বাইরে নিয়ে গেছে। বরং তারা বলে, এই কাজ প্রমাণ করেছে যে তার অন্তরে ঈমান ও বিশ্বাস নেই। যার জন্য সে কাফির। মুরজিয়ারা যা দাবি করছে, তা ধর্ম ও মানুষের বুদ্ধি দুটিই তাদের এই দাবির সাথে সাংঘর্ষিক। বুদ্ধি খুব সহজেই বলে দেয় যে, একজন ব্যক্তি সে বিশ্বাসী; কিন্তু তার ঈমান নেই এবং আল্লাহ এর সপক্ষে বলেন, 'তারা তাকে চেনে, যেন করে তারা তাদের পুত্রদের চিনত।' সূরা বাকারা, আয়াত : ১৪৬

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তারা আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে না, বরং জালেমরা আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে। সূরা আল আনআম, আয়াত : ৩৩

আমরা এ পর্যন্ত যা আলোচনা করলাম, তার উপর আরেকটু আলোকপাত করতে মুরজিয়া সম্পর্কে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার বক্তব্য এখানে উদ্ধৃতি করব:

'যারা সেই কথা বলে যা জাহম এবং আল সালহি বলেছে যে, আল্লাহ ও তার রাসূলকে নিয়ে ঠাট্টা করা এবং ত্রিত্ববাদের কথা বলা অন্তরের ধর্মবিরোধিতা নয় বরং তা ধর্মবিরোধিতার একটি লক্ষণ মাত্র। বিদ্রুপকারীর আল্লাহ তা'আলা এবং তার একত্ববাদের ব্যাপারে জ্ঞান থাকায় সে একজন বিশ্বাসী। তাদের কাছে যখন আপনি কুরআন ও সুন্নাহর প্রমাণ উপস্থাপন করবেন অথবা উম্মাহর আলেমরা যে বিষয়ের উপর ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন তা উপস্থাপন করবেন যে, এই বিদ্রুপকারী একটি ধর্মবিরোধী কাজ করেছে, তারা তখন একথা বলে প্রতিক্রিয়া

দেখায় যে ঈমানের জন্য এসব জরুরী নয়; আসলে এসব লোক গভীর পথভ্রষ্টতায় নিপতিত। (আল-ফাতাওয়া)

মুরজিয়াদের দলিল

মুরজিয়ারা তাদের বিশ্বাসের সপক্ষে দলিল তৈরি করেছে। আর এটা বেদাতিদের প্রথা যে, প্রথমে তারা বেদাত আবিস্কার করে এবং পরে এর সপক্ষে দলিল খুজে। আর এই বিপথগামী পন্থা সঠিকভাবে সত্য খুঁজার সংঙ্গে সাংঘর্ষিক। এই কারণে যে, যারা সত্য খুঁজছে তাদের উচিত নয় বেদাতের পক্ষে থেকে এর সাপোর্টে দলিল খোঁজা; বরং তাদের উচিত গবেষণায় বস্তুনিষ্ঠ ও আন্তরিক হওয়া।

যাইহোক, আল্লাহর দেওয়া পুরস্কার ও জান্নাত পাওয়ার জন্য নিজেকে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাত ও এর বিশ্বাসের অনুসারী বানানোই হল শ্রেষ্ঠ ও একমাত্র পথ । তাই আমাদের উচিত আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহর সাথে নিজেদের গেঁথে রাখা। আর এটা আমাদেরকে যে কোনো খারাপ কাজ থেকে দূরে রাখবে। দূরে রাখবে আল্লাহর শাস্তি থেকে। আমরা জান্নাতে আল্লাহকে সরাসরি দেখতে পাব। যেটা হবে অনিঃশেষ আনন্দ।